দৈনিক

06 DEC 2013 ৮

ভর্তিচ্ছু শিশুদের লইয়া ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করিতে হইবে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি লইয়া শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি দীর্ঘদিনের। ইহার কারণও সুবিদিত। সকল অভিভাবকই সন্তানকে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইতে চাহেন। ফলে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয় এক অভাবনীয় পরিস্থিতির। ফলে ঘুম হারাম হইয়া যায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক উভয়েরই। নিস্তার ছিল না কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদেরও। শিক্ষা যেইখানে আনন্দের বিষয় হওয়ার কথা ছিল, সেইখানে শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্নেই তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ভর্তি পরীক্ষা নামক ভয়াবহ ভীতি ও আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতার। তবে ইহা ছিল বিশাল একটি ডুবোপাহাড়ের চূড়ামাত্র। প্রকৃত অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে পুঁজি করিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল কোচিং ও ভর্তিবাণিজ্যসহ নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। গণমাধ্যমের কল্যাণে ইহার যে যৎসামান্য চিত্র জনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে শিহরিত হইয়াছিল সর্বস্তরের সচেতন মানুষ। এইসব খুব বেশিদিন আগের কথা নহে।

ক্ষুব্ধ জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে সরকার অবশেষে ২০১১ সালে একটি সমন্বিত ভর্তি নীতিমালা জারি করিয়াছে। ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার পরিবর্তে লটারিপ্রথার প্রবর্তন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কীভাবে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হইবে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও প্রদান করা হয় এই নীতিমালায়। নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় ভর্তিচ্ছু শিশুদের বয়সসীমাও। উদ্দেশ্য ছিল শিশু শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা নামক এই অমানবিক ভর্তিযুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ দেওয়া। পাশাপাশি ইহাও আশা করা হইয়াছিল যে, ভর্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অস্বচ্ছতার অবসান ঘটিবে। অভিভাবকরা ইহাতে স্বস্তিবোধ করিয়াছিল। জনগণ স্বাগত জানাইয়াছিল সরকারের এই সিদ্ধান্তকে। তবে উদ্বেগের বিষয় হইল, সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নীতিমালা বাধ্যতামূলক করা হইলেও রাজধানীর উল্লেখযোগ্য কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাহা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠিয়াছে। জানা যায়, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের বিধান না থাকিলেও নানা অজুহাতে শিশুদের লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হইতে বাধ্য করা হইতেছে। সেইসাথে আদায় করা হইতেছে অতিরিক্ত অর্থও। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইতিপূর্বে রাজধানীর একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও পরিস্থিতির কোনো হেরফের যে হয় নাই তাহা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিদ্যালয়সমূহের এই নীতিমালাবহির্ভূত স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের ফলে নূতন করিয়া হয়রানির শিকার হইতেছে শিশুরা। অপ্রস্তুত অভিভাবকদের অবস্থা আরও করুণ। কিন্তু সরকারি নীতিমালার লঙ্ঘন যাহারা করিতেছেন তাহাদের অজুহাতের অন্ত নাই। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে, ইহা পরীক্ষা নহে, প্রাথমিক বাছাই মাত্র। অন্যদিকে, সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, কোচিং বাণিজ্য, ভর্তিবাণিজ্য এবং শিশু ও অভিভাবকদের হয়রানি দূর করিতেই প্রথম শ্রেণিতে লটারির নিয়ম চালু করা হইয়াছে। এইখানে বাছাইয়ের নামে পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা অন্যায়। তবে শুধু নীতিমালা জারি করিয়া কিংবা সদুপদেশে যে কাজ হয় না তাহা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন প্রতিকারের একমাত্র পথ হইল আইনের যথাযথ প্রয়োগ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। আইনের শাসনের প্রশ্নে আপসের বা শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নাই। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই অনিয়ম-অস্বচ্ছতার শিকার হইয়া শিশুরা সমাজ ও শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ুক— বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে তাহা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নহে। কোমলমতি শিশুদের লইয়া কাহাকেও ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া যায় না।